হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 13, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, May 2013

''মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অদ্ভুত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক মুসলমান প্রীতি যে ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের কি গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে---একদিন ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহার বিচার করিবে।''

—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

নাবালিকা ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার

জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধে উত্তাল রাণীগঞ্জ

রানীগঞ্জে ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে মহিলাদের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ

২৯শে এপ্রিল সোমবার বর্ধমানের রানীগঞ্জে বাসন্তী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হল। দুপুরবেলায় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় দুইটি মুসলমান ছেলে খুরশিদ আলম (পিতা মহম্মদ সেলিম) ও আফতাব আনসারি (পিতা মহম্মদ মুকতার) মেয়েটিকে কিড্‌ন্যাপ করে তাকে জোর করে নিষিদ্ধ ওষুধ খাইয়ে দেয়। এতে মেয়েটি অসুস্থ বোধ করে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তাকে পার্শ্ববর্তী ঝোপে নিয়ে গিয়ে তারা ধর্ষণ করে। কিছুক্ষণ পর ওষুধের প্রভাব কাটলে মেয়েটি নিজেই তার পূর্ব কলেজপাড়ার হাসপাতাল পট্টির বাড়িতে ফিরে আসে এবং বাড়িতে সব কথা খুলে বলে।

মেয়েটির বাবা মেয়েটিকে নিয়ে থানায় এফ.আই.আর করতে গেলে পুলিশ এফ.আই.আর নিতে অস্বীকার করে এবং মেয়েটির বাবাকে থানা থেকে বের করে দেয়। এর কারণ হল অভিযুক্ত ওই দুই মুসলিম যুবক স্থানীয় টি.এম.সি.-র এম.এল.এ. সোহরাব আলির একান্ত অনুগত। এতবড় একটা ঘটনার পরেও পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারা ৬০ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। পুলিশ এই অবরোধ জোর করে তুলতে গেলে প্রতিবাদী হিন্দুদের সঙ্গে তাদের বিরোধ লাগে। পুলিশ হিন্দুদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালায়। এতে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে।

শেষাংশ ২ পাতায়

গরু পাচারকারীদের আক্রমণে হিন্দু গ্রাম বিধ্বস্ত

উত্তর ২৪ পরগণা বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত খাসপুর (পোঃ-রামচন্দ্রপুর) গ্রামে আতঙ্ক ছড়ালো গরু পাচারকারীরা। দীর্ঘদিন ধরেই বনগাঁ, বাদুড়িয়ার গ্রামবাসী গরুপাচারকারীদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ। এই নিয়ে তারা বিভিন্ন সময়ে পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছে নালিশ জানিয়েছে। এর ফলেই খাসপুর গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার নেমে এল বলে সেখানকার মানুষের ধারণা।

গত ২৩শে এপ্রিল রাত এগারোটা নাগাদ গরু পাচারকারীদের একটি দল গ্রামে ঢুকে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। নিরাল মণ্ডল (পিতা শুকচাঁদ মণ্ডল), মিজানুর মণ্ডল ও ফজলুর মণ্ডল (পিতা বাকির আহম্মদ মণ্ডল)-এর নেতৃত্বে প্রায় শ'দুয়েক মুসলিম দুষ্কৃতি খাসপুর গ্রামটি আক্রমণ করে। কমলা মণ্ডলের (স্বামী নটবর মণ্ডল) বাড়িতে ঢুকে তারা ঘরদোর, জানলা দরজা ভাঙতে থাকে। তাদের হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল। বাড়ির আসবাব সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দেয় এবং কমলাদেবীর পুত্রবধূ মালতী মণ্ডলের শ্লীলতাহানি করে। তার ছেলেকে মারধোর করে এবং বারবার প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

গরুপাচারকারীদের আক্রমণে বিধ্বস্থ বাড়ির সামনে আক্রান্ত গৃহকর্ত্রী

ঠিক ওই একই সময়ে নীলকমল বৈদ্য, কমল বৈদ্য, জগন্নাথ রায়, শ্যামল বৈদ্য, ঊর্মিলা বৈদ্য, কালীপদ মণ্ডল, নৃপেণ মণ্ডল এবং শ্রীকান্ত মণ্ডলের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর ও মারধোর করে দুষ্কৃতিরা। ঊর্মিলা বৈদ্যকে চুলের মুঠি ধরে কিল-চড় ও লাথি মারে এবং তার গলা টিপে ধরে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। গর্ভবতী মহিলা শিখা বৈদ্যকে (স্বামী

শেষাংশ ২ পাতায়

রামনবমী ও মহাবীর জয়ন্তীতে চন্দননগর উত্তপ্ত

গত ২১শে এপ্রিল, রবিবার রামনবমী উপলক্ষে হুগলীর চন্দননগরে এক বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। ঐ শোভাযাত্রায় মহিলা ও শিশুসহ আনুমানিক ছয় থেকে সাত হাজার লোক উপস্থিত ছিল। ঐ শোভাযাত্রা যখন উর্দি বাজারের ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তখন কিছু বিহারী মুসলমান শোভাযাত্রা দেখে বিশ্রীভাষায় গালিগালাজ করে। হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করলে মারামারি শুরু হয়ে যায়। তখনকার মতো বিষয়টি মিটে গেলেও রাত ৮টার সময় শোভাযাত্রা ফেরত হরিজন হিন্দুদের উপর মুসলমানরা সশস্ত্র হামলা চালিয়ে হিন্দুদের মারধোর করে। তিনজন হিন্দু গুরুতর আহত হয়। এর প্রতিবাদে বিপুল সংখ্যক হিন্দু পথে বেরোলে প্রশাসন ও অঞ্চলের বিধায়ক অশোক সাউ বিষয়টি মধ্যস্থতা করার জন্য ২২ তারিখ সন্ধ্যা ৬টায় চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে হিন্দু ও মুসলমানকে শান্তি বৈঠকে ডাকেন। বৈঠকে হিন্দু ও মুসলমানকে এলাকার শান্তি বজায় রাখার জন্য আহ্বান করা হয় এবং একটি শান্তি কমিটি স্থাপন করা হয়। কমিটিতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা থাকেন।

কিন্তু শান্তি বৈঠকে যোগদান ও শান্তি কমিটি তৈরি করা মুসলমানদের এক অছিলামাত্র তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২৫শে এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) মহাবীর জয়ন্তীর দিন। মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে উর্দিবাজারের হনুমান মন্দির থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। ঐ শোভাযাত্রায় এলাকার হিন্দুদের সঙ্গে শান্তি কমিটির বেশ কয়েকজন মুসলমানও ছিল। কিন্তু শোভাযাত্রা শেষে তিনজন হিন্দু যুবক বিক্রম, ইসু ও রামা মোটরবাইকে করে যখন উর্দিবাজার থেকে ঝাউবাগানের দিকে যাচ্ছিল তখন শেখ মান্নান, শেখ মুন্না সহ কয়েকজন মুসলমান তাদের পথ আটকায় ও গালিগালাজের সঙ্গে প্রাণে মারার হুমকি দিতে থাকে। বিক্রমরা তখনকার মতো তাদের যেতে দিতে বললে হঠাৎই পিছন থেকে শেখ মান্নান ইসুর মাথায় ভাঙা বোতল দিয়ে আঘাত করে। ইসু পড়ে যায় এবং তার মাথা ফেটে রক্ত পড়তে থাকে। এরপর শেখ মান্নান, শেখ মুন্না, শেখ হেলো ইসু ও রামাকে মারতে শুরু করে। নিকটবর্তী স্টার ক্লাব থেকে শেখ পারভেজের নেতৃত্বে জনাকয়েক মুসলমান সোর্ড, রড নিয়ে তাদের আক্রমণ করে। দুষ্কৃতি মুসলমানদের আক্রমণে বিক্রম, রামা, ইসু মারাত্মক রকমে জখম হয়। তাদের থানায় নিয়ে গেলে জানে মারার হুমকিও দেয় দুষ্কৃতিরা। কিন্তু হুমকিকে অগ্রাহ্য করে বিক্রম, রামা ও ইসু থানায় গেলে পুলিশ তাদের হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতাল থেকে এসে তারা শেখ মান্নান, শেখ মুন্না, শেখ হেলো ও শেখ পারভেজের নামে থানায় একটি এফ.আই.আর করে (কেস নং ৯২/১৩)। এই এফ.আই.আর-এর ভিত্তিতে পুলিশ শেখ মান্নান, শেখ মুন্না, শেখ হেলো ও শেখ পারভেজকে ২৬ তারিখ রাতে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে এই মুসলিম দুষ্কৃতিরা জেলে আছে।

আমাদের কথা

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু সংহতির কর্তব্য

গত একমাসে এই রাজ্যে যত ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে আমাদের কাছে খবর এসেছে—রাণীগঞ্জে ১১ বছরের বালিকার ধর্ষণকে কেন্দ্র করে তদিন ধরে পুলিশ ও হিন্দুর লড়াই ও কার্ফু, আসানসোলে রামনবমীর শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ, কেতুগ্রামে গাজনের সন্ন্যাসীদের স্নানযাত্রার উপর আক্রমণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পন্ড হয়ে যাওয়া, বাদুড়িয়ার খাসপুর গ্রামে গো-পাচারকারীদের আক্রমণ, অত্যাচার ও শ্লীলতাহানি, চন্দননগরে রামনবমীর শোভাযাত্রা ফেরত মানুষের উপর আক্রমণ, জীবনতলা থানার ফকিরতকিয়া গ্রামের হিন্দু ক্লাবের উপর আক্রমণ ও বিভাস মন্ডলকে আহত করা, হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার বাকুল গ্রামে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ, মিনাখা-র নিমিচি গ্রামে সরকারী স্কুলে মিলাদ করা নিয়ে সংঘর্ষ, বীরভূমের রামপুরহাট থানার ব্রাহ্মণী গ্রামে মন্দিরে দেবমূর্তি ভাঙা নিয়ে রামপুরহাট স্বতঃস্ফূর্ত বনধ, সন্দেশখালির সরবেড়িয়াতে সিপিএম থেকে পাল্টি খাওয়া তৃণমূলী জনৈক শাজাহান শেখের হাতে দুজন নিরীহ হিন্দুর উপর অত্যাচার, মেদিনীপুর জেলায় রাধামণি বাজারে সংঘর্ষ, সর্বশেষ মেদিনীপুর শহরে মন্দির ও মাজার ভাঙা নিয়ে সংঘর্ষ---এর মধ্যে অধিকাংশই সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি, কোন টিভি চ্যানেল দেখায়নি।

আমাদের দপ্তরেই এতগুলো ঘটনার খবর এসেছে। এরকম ঘটনা ঘটেছে আরও অসংখ্য। অথচ রাজ্যের মানুষ, দেশের মানুষ এগুলো জানতে পারছে না। জানছে শুধু রাজনৈতিক সংঘর্ষ, সারদা চিটফান্ড কান্ড ও আই. পি. এলের কথা। বাস্তব এই পরিস্থিতির কথা না জানা, এই অজ্ঞানতা আমাদের রাজ্যকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে, তা এক গভীর দুশিন্তার বিষয়।

এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে অন্যরা অসচেতন হলেও হিন্দু সংহতির কর্মীরা সচেতন। তারা নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। পুলিশের আচরণ তো হিন্দু বিরোধী। তাই সাধারণ মানুষ, এমনকি বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের কর্মীরাও মুসলিম সংক্রান্ত সমস্যায় পড়লে সংহতির দপ্তরে ছুটে আসেন। অর্থাৎ সংহতি কর্মী সদস্যদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। তাই, সংহতি কর্মীদেরকে এখন পরিস্থিতির আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। এই ভূমিকা যদি আমরা পালন করতে পারি, তাহলে ইতিহাসে আমাদের নাম হিন্দু প্রতিরোধের নির্মাতা হিসাবে লেখা হবে। কিন্তু এর জন্য আরও সংগ্রাম ও সংঘর্ষের জন্য তৈরী থাকতে হবে।

জমি দখল করে মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরির অপচেষ্টা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কালীবটতলা মোড় অঞ্চলে বুদ্ধেশ্বর সরদার নামক এক ব্যক্তির বেশ কিছুটা জমি আছে। গত ১০ বছর ধরে বর্গাদার হিসাবে সুধীর মণ্ডল বুদ্ধেশ্বর সরদারের এই জমির দেখভাল করছে। জমিটির বেশিরভাগ অংশ চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়। বেশ কয়েক মাস আগে এলাকার দুষ্কৃতি বলে পরিচিত অশোক নস্কর এই জমির একটি নকল কাগজ তৈরি করে জমিটি দাবি করে এবং কালী বটতলার মোড়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি দখল করে একটি দোকানঘর তৈরি। অশোক কিছুদিন আগে বিদ্যুৎ চুরির দায়ে জেল খেটে এসেছে। কিন্তু কিছু পুলিশের সঙ্গে অশোকের যোগসাজস থাকায় তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেও কোন ফল হয়নি। বুদ্ধিশ্বর বাবু থানা থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে সরাসরি কোর্টে অশোক নস্করের বিরুদ্ধে জমি জালিয়াতির কেস করে। কেসে বুদ্ধিশ্বরবাবুর জয় হয়।

কিন্তু এরমধ্যে অশোক নস্কর নিয়াত মোড়ল-এর কাছে ঐ বিতর্কিত জমি কিছু টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। নিয়াত মোড়ল ঐ জমির উপর একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরির পরিকল্পনা করে। সম্পূর্ণ হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাত্র ১০ ঘর মুসলমানের বাস এবং ওখানে একটি প্রাচীন কালীমন্দির আছে, যার নামে ঐ অঞ্চলের নাম কালী বটতলার মোড়। ফলে মুসলমানদের এই অসাধু প্রয়াসে এলাকার হিন্দুরা গর্জে ওঠে। গ্রামবাসীরা জানায়, বিতর্কিত জমিতে তারা কিছুতেই মসজিদ করতে দেবে না। অঞ্চলের হিন্দু সংহতি কর্মীরা সাধারণের এই লড়াইকে উৎসাহিত করে তুলছে এবং জমি বাঁচাবার এই লড়াইতে সকলকে দৃঢ় সংকল্প হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছে।

১ম পাতার শেষাংশ

জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ

মুসলিম দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার না করে হিন্দুদের প্রতিবাদ অবরোধে পুলিশ লাঠি চালালে হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। স্থানীয় মানুষ অনেকগুলো গাড়ি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয় যার মধ্যে দুটো পুলিশের গাড়িও ছিল। ক্ষিপ্ত জনতা দুটি টি.এম.সি. পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলে তা সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। দীর্ঘসময় ধরে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় লোকেদের লড়াই চলতে থাকে, র‍্যাফ নামিয়েও পুলিশ এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এ.ডি.সি.পি. সেন্ট্রাল সুরেশ চাড়িয়া এবং এ.সি.পি. অজয় প্রসাদ ঘটনাস্থলে এসে বারবার হিন্দুদের শান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে হিন্দুদের ক্ষোভ প্রশমিত হয়।

কিন্তু পুলিশ সেই রাতে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে চুয়ান্ন জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে, যার মধ্যে ধর্ষিতা মেয়েটির ভাইও ছিল। এই অন্যায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে স্থানীয় মহিলারা থানার সামনে ধর্ণা দিলে, থানায় কোন মহিলা পুলিশ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ লাঠি চার্জ করে মহিলাদের হটিয়ে দেয়। এতে আটজন মহিলা দারুণভাবে আহত হয়।

হিন্দুদের প্রবল আন্দোলনের চাপে পুলিশ শেষ পর্যন্ত দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়।

১ম পাতার শেষাংশ

গরু পাচারকারীদের আক্রমণ

শ্যামল বৈদ্য) চুলের মুঠি ধরে নির্মমভাবে কিল-চড়-লাথি মারে।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে মুসলিম দুষ্কৃতিরা এই তাণ্ডব চালায়। অনেকের ঘর এমনভাবে ভেঙেছে যে তারা এখন আশ্রয়হীন। এমন অবস্থায় খাসপুর গ্রামের নিরীহ মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। নিরাপত্তার অভাব ও প্রাণহানির আশঙ্কায় তারা রাতে ঘুমাতে পারছে না। ২৪শে এপ্রিল গ্রামবাসী বাদুড়িয়া থানায় একটি এফ.আই.আর করে (কেস নং ২১৭/১৩)। এখন দেখার গরু পাচারকারীদের এই নারকীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রশাসন কত দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।

গাজনের স্নানযাত্রায় মুসলিমি তাণ্ডব

বর্ধমান জেলার কাটোয়া সাবডিভিশনের অন্তর্গত কেতুগ্রামে প্রায় ৮০ শতাংশ হিন্দুর বাস ও ২০ শতাংশ মুসলমানের বাস। এই অঞ্চলের হিন্দুরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চৈত্র মাসে শিবের উপাসনা করে আসছে, যাকে সাধারণভাবে আমরা গাজনের উৎসব বলি। প্রথা অনুযায়ী শিব ভক্তেরা বিশেষ দিনে প্রভু শিবের ৫টি মূর্তি নিয়ে কেতুগ্রাম থেকে প্রায় ১০ কিমি দূরে উদ্ধারণপুর গঙ্গার ঘাটে স্নানযাত্রায় যায়। ১১ই এপ্রিল একটি মিটিং হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন এস.ডি.পি.ও., এ.ডি.এম., কেতুগ্রাম থানার ও.সি. ও সি.আই.। এই মিটিং-এ ঠিক হয় যে এই শোভাযাত্রা কোন পথ দিয়ে যাবে। যে পথ দিয়ে শোভাযাত্রার রুট ঠিক হয় সেই পথে একটা মসজিদ পড়ে। তাই দুপুরের নামাজের পর ১টা ৫ মিনিটে শোভাযাত্রা বেরোবে ঠিক হয়।

প্রসঙ্গত আগের বার শোভাযাত্রার সময় মুসলমানরা অনেক বাধার সৃষ্টি করেছিল, তাই এবারে যাতে কোন সমস্যা না হয় তারজন্য শান্তি বৈঠক স্নানযাত্রার আগেই করা হয়। সেই মতো ১২ই এপ্রিল দুপুর ১টা ৫-এর পরে স্নানের শোভাযাত্রা বের হয়। যখনই শোভাযাত্রা মসজিদের (যেটা থানার খুব কাছে) সামনে আসে, তখন মসজিদ থেকে মুসলমানরা শোভাযাত্রায় ঢিল ছুঁড়তে থাকে। অতর্কিত এই আক্রমণে হিন্দুরা হতচকিত হয়ে যায় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক দৌড়াতে থাকে। সেই সুযোগে হিন্দুদের উপর এ.ডি.এম. ও এস.ডি.পি.ও.-র নেতৃত্বে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়, তারপর হিন্দুদের উপর লাঠিচার্জ করে। অথচ ঘটনার সূত্রপাত সৃষ্টিকারী মুসলমানদের পুলিশ কিছু বলল না। মুসলমান ও পুলিশের আক্রমণে এই সময় হিন্দুরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রভু শিবের পাঁচটি মূর্তিই উধাও হয়ে যায়। মুসলমানরা ডালিম শেখের নেতৃত্বে হিন্দুদের দোকান লুটপাট করে। শ্যামল দে, উজ্জ্বল ও মধু মোদকের দোকান পুলিশের সামনেই মুসলমানরা লুট করে। মধু মাঝি নামক এক ব্যক্তির এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে মুসলমানরা তাকে প্রচণ্ড মারধোর করে, পুলিশ এই সময়ে দর্শকের ভূমিকায় ছিল। মুসলমানদের লুটপাট ও মারধোর সাঙ্গ হলে পুলিশ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে এবং র‍্যাফ নামিয়ে দেয় যাতে হিন্দুরা কোনরকম প্রতি আক্রমণ না করতে পারে। এবং এই খবর যাতে বাইরে না যায় তারজন্য হিন্দুদের গ্রামের বাইয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয় প্রশাসন।

সমস্ত ঘটনাটার পিছনে কেতুগ্রাম থানার আই.সি. আবদুল গফরের প্ররোচনা ছিল। গফর এই ঘটনায় চার হিন্দু তপন সেনগুপ্ত, নাদু হাজরা, মিঠু দাসগুপ্ত, মিঠুন দে-কে গ্রেপ্তার করে। মুসলমান ও পুলিশের আক্রমণে অরুণ হাজরা, খেরু হাজরা, মধু এবং নাড়ু মোদকের ৬৫ বছরের বৃদ্ধা মা আহত হয়। জানা গেছে যে, কেতুগ্রাম (২) পঞ্চায়েত প্রধান তৈমুর রহমান (ডাক নাম টুটুল) হিন্দুদের উপর এই আক্রমণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

কেতুগ্রামের কিছু পরিবারে কম্পিউটার ও ওয়েরসাইট আছে। তারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানতে পারে যে হিন্দু সংহতির ওয়েবসাইটে তাদের উপর এই অত্যাচারের ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছে। সংহতির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের ঘটনা সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে, এটা কেতুগ্রামের হিন্দুদের উৎসাহিত করে তোলে। তারা বুঝতে পারে তারা একা নয়, হিন্দু সংহতির মতো শক্তিশালী হিন্দু সংগঠন তাদের সঙ্গে আছে। তারা প্রশাসনকে জানায় যে তাদের উপর মুসলমানদের এই আক্রমণ আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়েছে এবং তাদের উপর এই অত্যাচারের প্রতিকার না করলে তারা হিন্দু সংহতি ও তার সভাপতি শ্রী তপন ঘোষকে সেই গ্রামে আহ্বান জানাবে। এই খবরটা স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। ১৪ই এপ্রিল লোকাল এম.এল.এ. শেখ সাহনাজ (টি.এম.সি.), ডি.এম. ওঙ্কার সিং মিনা, এবং বর্ধমানের অ্যাডিশনাল এস.পি. কেতুগ্রামে আসেন এবং হিন্দু- মুসলমানদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের এক চেষ্টা করেন। এই মিটিংটি হয় এলাকার কমিউনিটি হল ঐক্যতান লজে। হিন্দুরা তাদের পাঁচটা দাবী জানায় ডি.এম.-এর কাছে। এগুলো হল—সাম্প্রদায়িক আই.সি. আবদুল গফরের অবিলম্বে অপসারণ, যেসব হিন্দুদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কোন শর্ত ছাড়াই তাদের ছেড়ে দিতে হবে, গাজনের স্নানযাত্রাকে সুসংঘবদ্ধভাবে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিতে হবে এবং ঐ ধর্মীয় শোভাযাত্রা ১০০টি ঢাক বাজিয়ে যে পথ দিয়ে যায় অর্থাৎ মসজিদের সামনে দিয়েই যাবে। সর্বশেষ দাবিটি হল এই ধর্মীয় শোভাযাত্রা প্রতিবছর সুষ্ঠভাবে যেন যেতে পারে তার ব্যবস্থা প্রশাসনকে করতে হবে।

হিন্দুদের এই পাঁচটি দাবীর বিরুদ্ধে মুসলমানরা কোন প্রতিবাদ করেনি, বরং হিন্দুদের এই দাবীকে তারা সমর্থন জানিয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, হিন্দু সংহতি নামটা এলাকার মুসলমানদের মধ্যে একটা ভীতির সৃষ্টি করেছে। প্রশাসন হিন্দুদের এই দাবীগুলোকে মেনে নিয়েছে এবং তাদের অসমাপ্ত স্নানযাত্রার দ্রুত যাতে ব্যবস্থা করা যায় তারজন্য নির্দিষ্ট তারিখ হিন্দুদের নির্ণয় করতে বলেছে।

ফকির তকিয়ায় সংহতি কর্মীকে মারধোর

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার অন্তর্গত বেশ কয়েকটি গ্রামে হিন্দু সংহতির কাজ বেশ ভালো। হিন্দুরা এখানে বেশ শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এরকম একটি গ্রাম হল ফকির তকিয়া।

গত ১৬ই এপ্রিল সন্ধ্য সাতাটা নাগাদ সংহতি কর্মী বিভাস মণ্ডল (পিতা সুভাষ মণ্ডল) স্থানীয় বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার পথে বিভাস পাড়ার ক্লাব ঘরে ঢোকে খেলা ও বই দেখার জন্য। এলাকার মুসলিম যুবক সাহাজান গাজী বিভাসকে ক্লাবে ঢুকতে দেখে আনছার গাজী নামে আর একজনকে ফোন করে। আনছার গাজী প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন যুবক নিয়ে সেখানে আসে। বিভাসকে ডেকে বলে তোরা এখানে মিটিং করছিস কেন। তখন বিভাস তাদের বলে এখানে কোন মিটিং হচ্ছে না। কিন্তু সাজাহান, আনছাররা বিশ্বাস করে না। এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। হঠাৎ-ই সাজাহানরা বিভাসকে মারধোর শুরু করে। প্রচণ্ড মারে বিভাস ঘটনাস্থলে অজ্ঞান হয়ে যায়। তখন সাজাহানরা তাকে ঐ অবস্থায় ফেলে চলে যায়। জ্ঞান ফিরলে বিভাস দেখে তাকে স্থানীয় হিন্দুরা ডাক্তারখানায় নিয়ে এসেছে। বিভাসের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন আছে। পরদিন বিভাস অভিযুক্তদের নামে জীবনতলা থানায় একটি কেস করে। কেস নং ২১৯/১৩। বিভাসকে আক্রমণকারী অভিযুক্তরা হল জবেদ মোল্লা (পিতা আবেদালী মোল্লা), আনারুল গাজী (পিতা বাসা গাজী), সানারুল গাজী (পিতা বাসা গাজী), সফিক গাজী (পিতা আজেদ গাজী), রফিকুল গাজী (পিতা আজেদ গাজী), সাইফুল গাজী (পিতা আজেদ গাজী), আনছার গাজী (পিতা আজেদ গাজী), সাজাহান গাজী (পিতা আজেদ গাজী) ও আরো অনেকে।

রাস্তা নিয়ে বিরোধিতা

সাঁকরাইলে গৃহবধূর শ্লীলতাহানি

হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত (নাজিরগঞ্জ ফাঁড়ি) নিমতলা বারোয়ারিতলা গ্রামে সুস্মিতা দাস (১৮ বছর) নামে এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানি ও হত্যার চেষ্টা করা হয়। এই আক্রমণকারীরা হল জাফর (২২ বছর), জাহাঙ্গীর (২৬ বছর) ও অপর একজনের নাম জানা যায়নি।

এই ঘটনার মূল কারণ জানতে হলে আমাদের কিছুটা পিছিয়ে যেতে হবে। অঞ্চলে সোমবাবু বলে পরিচিত এক ব্যক্তি নিমতলা বারোয়ারিতলা গ্রামে নিজ উদ্যোগে ও খরচে একটি রাস্তা তৈরি করে। মূলতঃ গ্রামবাসীদের চলাচলের সুবিধার জন্য তিনি এই উদ্যোগ নেন। কিন্তু রাস্তা তৈরি হওয়ার পর এলাকার মুসলমানরা ঐ রাস্তা ব্যবহার করতে শুরু করে এবং রাস্তার উপর দিয়ে তারা গরুর মাংসও নিয়ে যেতে থাকে। এতে অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। গত ভাইফোঁটার দিনে গরুর মাংস নিয়ে যাওয়া নিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রবল বচসা হয় এবং দুজন মুসলমানকে মারা হয়। প্রতিবাদী হিন্দুদের মধ্যে কুণাল দাসও ছিল, যে মুসলিম আক্রমণের শিকার সুস্মিতা দাসের স্বামী। তাই সুস্মিতাকে শ্লীলতাহানি ও হত্যার চেষ্টা যে পূর্বোক্ত ঘটনার প্রতিশোধ তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

৯ তারিখ সকাল ১১টার সময় জাফর ও জাহাঙ্গীর হকার সেজে কুণাল দাসের বাড়িতে আসে ও সুস্মিতাকে তাদের জামাকাপড় কেনার জন্য জোর করতে থাকে। কিন্তু সুস্মিতা তা কিনতে অস্বীকার করে। তখন সেই সময়ে ঘরে সুস্মিতার শাশুড়ি উপস্থিত ছিল। কিন্তু তিনি বেরিয়ে গেলে তৃতীয় মুসলমান ছেলেটি (যার নাম জানা যায়নি) কুণালের বাড়িতে ঢুকে জাফর ও জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যোগ দেয় এবং সুস্মিতাকে আক্রমণ করে। তার শ্লীলতাহানি করে এবং ব্লেড দিয়ে তার শরীরে আঘাত করে। নিজেকে দুষ্কৃতিদের হাত থেকে বাঁচাতে সুস্মিতা চিৎকার করে উঠলে দুটি হিন্দু ছেলে পুলক কোলে ও মানস পাত্র কুণাল দাসের বাড়িতে ঢুকে দেখে সুস্মিতা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ তারা সুস্মিতাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। চিৎকার চেঁচামেচিতে অঞ্চলের হিন্দুরা বেরিয়ে পড়ে এবং জাফর ও জাহাঙ্গীরকে ধরে ফেলে। কৃতকর্মের জন্য তাদের ব্যাপক মারধোর করা হয়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পড়ে এবং জাফর ও জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তৃতীয় মুসলমান ছেলেটিকে ধরা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়া দুষ্কৃতি জাফর ও জাঙ্গালীরকে পুলিশ থেকে ছাড়াবার জন্য এলাকার সমস্ত মসদিজ থেকে মাইকে ঘোষণা শুরু হয়ে যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ হাজার সশস্ত্র মুসলিম যুবক ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তাদের মধ্যে আগর, সাঁকরাইল, চাঁপাতলা, নাজিরগঞ্জ থেকে অনেক মুসলিম যুবক আসে, বাকি আসে কলকাতার লিচুবাগান ও মেটিয়াব্রুজ থেকে। জড়ো হওয়া মুসলিমরা বারোয়ারিতলাকে আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে হাজার জন মুসলিম যায় নাজিরগঞ্জ ফাঁড়িতে জাফর ও জাহাঙ্গীরকে ছাড়াতে এবং তারা জোর করে তাদের পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ছাড়িয়েও নিয়ে আসে।

সুস্মিতা দাস নাজিরগঞ্জ ফাঁড়িতে এফ.আই.আর. করতে গেলে ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার সুমন দাস তাকে বাধা দেয় এবং একটা ভুল এফ.আই.আর. লিখিয়ে নেয়। অদ্ভুতভাবে পুলক কোলে ও মানস পাত্রকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভঙ্গ করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। নিজেদের আত্মরক্ষার্থে হিন্দুরা বারোয়ারিতলার টি.এম.সি. নেতা সুব্রত কাঁড়ার সঙ্গে দেখা করতে যায়। সুব্রতবাবু নিতলা পাঁচপাড়া পঞ্চায়েতে উপপ্রধান। কিন্তু সুব্রতবাবু হিন্দুদের কোন অভিযোগ তো শোনেননি, উল্টে তিনি মুসলমানদের ঐ রাস্তা ব্যবহার করতে দেওয়ার উপদেশ দেন। হিন্দুরা এর প্রতিবাদে ৯ তারিখ বিকেল ৫টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত হাওড়া-আলমপুর রোড অবরোধ করে।

১০ তারিখ সকালে ঘটনাটি যখন হিন্দু সংহতির কর্মীরা জানতে পারে তখন তারা নাজিরগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে যায় এবং তাদের প্রতিবাদের ফলে পুলক কোলে ও মানস পাত্রকে ফাঁড়ি থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেদিন হিন্দু সংহতির ছেলেরা যখন একটি মিটিং করছিল তখন টি.এম.সি. নেতা সুব্রত কাঁড়ার সেখানে আসে এবং মুসলমানদের জন্য রাস্তা খুলে দেওয়ার জন্য আবার পরামর্শ দেয়।

এর পরদিন ১১ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, সাঁকরাইল থানার ও.সি. হিন্দু সংহতির ছেলেদের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। তাতে ও.সি. জানায় থানা এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষার জন্য উভয় সম্প্রদায়কে এই মিটিং-এ ডাকা হচ্ছে। তাতে হিন্দুদের ৫ জন ও মুসলমানদের ৫ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে যাদের কাজ হবে এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা। মিটিং শুরু হয় সন্ধ্যে ৭টার সময় এবং তাতে হিন্দুদের পক্ষ থেকে চারজন যোগ দেয়। মিটিং-এর বৈশিষ্ট্য হল হিন্দু সংহতির কর্মীরা ছাড়া প্রত্যেক রাজনৈতিক দল মুসলমানদের পক্ষে কথা বলে। সুব্রত কাঁড়ার মিটিং-এ হিন্দু সংহতির কর্মীদের হুমকি দিয়ে বলে সে একাই মুসলমানদের জন্য রাস্তাটা খুলে দেবে এবং প্রয়োজন হলে জোর করে। কিন্তু এই হুমকি হিন্দুদের টলাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত খবর যে বোসবাবুর তৈরির রাস্তা এখনও মুসলমানরা ব্যবহার করছে না।

কালা যাদুর নাম করে হিন্দু বালিকাকে ধর্ষণ

জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর ব্লকের মাদারিহাট থানার অন্তর্গত জয়শ্রী চা বাগানের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী কমলাকে (নাম পরিবর্তিত) কালা যাদুর নাম করে ধর্ষণ করল দুজন মৌলবী।

ঘটনাটি ঘটে ২৮শে মার্চ সকাল সাড়ে নটার সময়। হেমবালা নামক এক মহিলা তার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে ঐ অঞ্চলে বাস করে। মেয়েটি পিতৃহীন এবং তারা হতদরিদ্র। ঘটনার দিন সকালে দুজন মৌলবী তাদের ঘরে আসে এবং বলে কালাযাদু করে মেয়েটিকে ইংরাজী ও অঙ্কে ভালো নম্বর পাইয়ে দেবে। মৌলবীদের এই লোভনীয় প্রস্তাবের ফাঁদে পরে হেমবালা তাতে রাজি হয়ে যায়। তখন মৌলবীরা বলে যে, কালাযাদু করতে গেলে তেল ও জলের প্রয়োজন। মৌলবীদের কথা অনুযায়ী হেমবালা পাশের বাড়িতে জল ও তেল আনতে গেলে সেই সুযোগে মেয়েটিকে একা পেয়ে মৌলবীরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেয়েটির চিৎকারে হেমবালা দ্রুত এসে দেখে মৌলবীরা তার মেয়েকে ধর্ষণ করছে। তখন হেমবালা একটি লাঠি নিয়ে মৌলবীদের মারতে শুরু করে। এই ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে হিন্দুদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তারা হেমবালাকে নিয়ে মাদারিহাট থানায় অভিযোগ করতে যায় কিন্তু স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের থানায় গিয়ে অভিযোগ করতে দেয়নি। তারা স্থানীয় হিন্দুদেরকে ব্যাপারটি মিটমাট করে নিতে বলে। মুসলমানের দাসত্বকারীর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এরকম এক জঘন্য অন্যায়কে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

মুসলিম দুষ্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত হল শ্যামচাঁদ মন্দির

নদীয়ার শান্তিপুরে বিখ্যাত শ্যামচাঁদ মন্দির বারবার মুসলিম দুষ্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। ৭০০ বছরের পুরানো এই মন্দিরটি অসামান্য ভাস্কর্য ও এলাকার হিন্দুদের অনুপ্রেরণার আশ্রয়স্থল বলে অঞ্চলে জনপ্রিয়। ৫ই এপ্রিল ২০১৩, গভীর রাতে মুসলমান দুষ্কৃতিরা মন্দিরের তালা ভেঙে মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু ইন্টারলক্ সিস্টেম থাকায় মুসলিম দুষ্কৃতিরা শেষ পর্যন্ত মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেনি। স্থানীয় মানুষরা জানায় যে বিখ্যাত শ্যামচাঁদ মন্দির এই নিয়ে চারবার মুসলিমরা আক্রমণ করলো। পরদিন অর্থাৎ ৬ই এপ্রিল এলাকার হিন্দুরা একত্রিত হয়ে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানায় এবং একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে শান্তিপুর থানায় যায় কিন্তু থানা অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। থানা হিন্দুদের এই অভিযোগ নিতেই শুধু অস্বীকার করেনি, তারা যে মুসলিম দুষ্কৃতি ধরতে অপারগ এ কথা অকপটে সকলের সামনে স্বীকার করে নেয়।

হারিয়ে গেল হিন্দু সমাজের দু'টি ছেলে

ষড়যন্ত্রের জাল ঃ বজবজ-মুম্বই-হায়দ্রাবাদ

বজবজের পাশে ছোট্ট শহর পূজালি। এখানেই আছে গোয়েঙ্কাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র যা থেকে সি.ই.এস.সি.-তে বিদ্যুৎ সাপ্লাই করা হয়। এই পূজালিতে ৯-নং ওয়ার্ড রাজীবপুরে থাকেন এক অতি দরিদ্র ব্যক্তি নাম পঞ্চুচরণ মণ্ডল, বয়স ৭০ বছর। তাঁর দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দুই ছেলে তরুণ ও বরুণ। দারিদ্রের জন্য তাদের পড়াশোনা বেশীদূর হয়নি। তারাই জরির কাজ করে সংসার চালায়। মা-বাবাকে তারা খুবই ভালোবাসে। এই পূজালিতেই আছিপুর বড় বটতলায় থাকে শেখ গোলাম মোস্তাফা। তার ছেলেরা শেখ সাহিদ ও শেখ মেসুয়া জরির কাজের ওস্তাগর। মুম্বইতে তাদের জরির কারখানা আছে। প্রায় ৮ বছর আগে শেখ সাহিদ ও শেখ মেসুয়া ঘন ঘন দরিদ্র পঞ্চুচরণের বাড়ি যাতায়াত শুরু করল। তারা বড়ছেলে তরুণকে মুম্বই নিয়ে যেতে চায়। তরুণের বয়স তখন ১৭ বছর। তারা মা-বাবা ছেলেকে অত দূরে পাঠাতে চায় না। তখন গোলাম মোস্তাফা তরুণের মাকে তার বাড়িতে ডেকে পাঠায় ও অনেক প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দেয়। এত করে আগ্রহ করাতে এবং বেশি রোজগারের লোভে তরুণ শেখ সাহিদের জরির কারখানায় কাজ করতে মুম্বই যায়। তার বয়স তখন ১৭ বছর ৫ মাস। তার ৪ বছর পর ছোটভাই বরুণকেও ওই একই কাজে মুম্বাই নিয়ে যায়। প্রথমদিকে দুই ছেলে নিয়মিত পূজালির বাড়িতে যাতায়াত করত এবং মা-বাবাকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করত।

তারপর ওই ছেলেদের যাতায়াত কমতে থাকল। বাড়িতে টাকা দেওয়াও তারা বন্ধ করে দিল। জানা গেল যে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করে দেওয়া হয়েছে। তাদের বাবা পঞ্চুচরণ এবং মা কাননদেবী বজবজ থানায় ছোটাছুটি শুরু করলেন। থানার পুলিশ বলে দিল তারা কিছু করতে পারবে না। আলিপুরে এস.পি. অফিসে এসে অ্যাডিশনাল এস.পি.-র সঙ্গে কাননদেবী দেখা করলেন। তিনিও কিছু করলেন না। পূজালি পৌরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান ফৈজুল হকের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনিও বলে দিলেন কিছু করতে পারবেন না। গোলাম মোস্তাফার ছোট ছেলে শেখ মেসুয়া তরুণ-বরুণদের বাড়িতে এসে তাদের বৃদ্ধ বাবা-মাকে হুমকি দিয়ে বলে গেল যে তারা সব জায়গায় ছোটাছুটি যেন বন্ধ করে। তারা আর তাদের ছেলেকে ফিরে পাবে না।

তরুণ-বরুণের বন্ধুবান্ধবদের সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে তাদেরকে হায়দ্রাবাদে নিয়ে গিয়ে মুসলমান করা হয়েছে। দুই ছেলেরই মুসলিম মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছোটছেলে বরুণের নাম হয়েছে আবদুল্লা। সে তার মাকে ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, সে ওদের কথা না শুনলে তাকে খুন করা হবে। সে মা-বাবার কাছে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু সে অসহায়। তাকে সবসময় চোখে চোখে রাখা হয়েছে।

তাদের বৃদ্ধ বাবা-মা এখন অসহায়ের মত সব জায়গায় আকুল আবেদন নিয়ে যাচ্ছেন, যেন অন্ততঃ একটা ছেলেকে তাঁরা ফিরে পান।

মানবাধিকার কমিশন থেকে প্রশাসনের উপর চাপ

বাসন্তী থানায় আটকে রেখে গৃহবধূ শিবাণী সাঁপুই-এর উপর পুলিশি অত্যাচারের ঘটনা প্রথম প্রকাশিত হয় গত সংখ্যার 'স্বদেশ সংহতি সংবাদ'-এ। সংহতি সংবাদে প্রকাশিত এই খবর প্রশাসনের উপর মহলকেও নাড়িয়ে দিয়েছে। শিবাণী তার উপর অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগণার এস.পি. মানবাধিকার কমিশনে চিঠি দিয়ে তার উপর অত্যাচারের কথা জানান। মানবাধিকার কমিশন থেকে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। কিভাবে একজন মহিলাকে সারারাত থানায় (মহিলা পুলিশ না থাকা সত্ত্বেও) আটকে রেখে তার উপর শারীরিক নির্যাতন চালালো বাসন্তী থানার অফিসার খালেকুজ্জামাল, তা জানতে চেয়েছে মানবাধিকার কমিশন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও এই ঘটনা নিয়ে মুখর হয়েছে।

চাপে পড়ে বাসন্তী থানা এখন শিবাণী সাঁপুইকে ভালো চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে অভিযোগ তুলে নিতে বলছে। তার কাছে অভিযোগ তুলে নেওয়ার

ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিবাণী সাঁপুই

জন্য হুমকির ফোনও আসছে। কিন্তু শিবাণী তার উপর অত্যাচারের সুবিচার চায়। তাই কোন প্রলোভন বা হুমকি তাকে টলাতে পারেনি। শিবাণী সংহতির কর্মীকে জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম প্রতিবেশীর অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হচ্ছে। এবার প্রতিকার চেয়ে থানায় গিয়ে মুসলমান পুলিশ অফিসারের হাতে নিগৃহীত হতে হল। তার হারানোর আর কিছু নেই। এর শেষ সে দেখতে চায়। শিবাণীর এই লড়াইতে হিন্দু সংহতি তার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে।

কর্ণাটকে নির্বাচনের ফল ও বিজেপি-র ভবিষ্যৎ

তপন কুমার ঘোষ

বিজেপি-কে নিয়ে কিছু লেখা অনেকদিন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মনে হয় এইবার লেখার সময় এসেছে। কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র পরাজয় অনেককেই দুঃখ দিয়েছে। ২০০৮ সালেই প্রথম দক্ষিণ ভারতে বিজেপি ঢুকতে পেরেছিল কর্ণাটকে জয়লাভের মধ্য দিয়ে। বিজেপি সমর্থক ও হিন্দুত্ববাদীরা খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তাই এবারের পরাজয় তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত না হলেও বড়ই বেদনার। রাজ্যে বিজেপি-র দুর্নীতি ও ইয়েদুরাপ্পার দলত্যাগের ফলে ভোটে ভাঙন—এই দুটিকেই সবাই পরাজয়ের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করছেন। এমনকি অতি প্রবীণ ও বিজ্ঞ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিও পরাজয়ের জন্য দুর্নীতি ও জনতার চোখে বিজেপি-র ছবিকেই দায়ী করছেন। কিন্তু আমার স্পষ্ট মত হল যে, এই ২০১৩ সালের নির্বাচনে কর্ণাটকে বিজেপি হারেনি। বিজেপি হেরেছিল ২০০৮ সালেই। অর্থাৎ, ২০০৮ সালে কর্ণাটকে বিজেপি-র জয়কেই আমি বিজেপি-র পরাজয় রূপে চিহ্নিত করতে চাই।

দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব ভারতে অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে বিজেপি কোনদিনই বড়রকমের নির্বাচনী সাফল্য পায়নি। (কেন পায়নি—এই লেখার শেষে আমি সেখানেই পৌঁছবার চেষ্টা করব।) তাই ২০০৮-এ কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনে জয় ও সরকার গঠন —এটাকে বিরাট সাফল্য ও কৃতিত্ব বলেই সকলে ধরে নিলেন। জো জিতা ওহী সিকন্দর---এই ফর্মূলা অনুসারে বিজেপি-র জয়জয়কার হল। বিজয়ের ঔজ্জ্বল্যের পিছনে কোন অন্ধকার লুকিয়ে আছে কিনা—তা কেউ দেখতে চায় না। আর খুব কম লোকই তা দেখতে পায়। এরজন্য তো চাই সেইরকম চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব—যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সম্পদে যে রয় ভীত বিপদে একান্ত নির্ভীক' (রামের চরিত্র বর্ণনা)। তাই ২০০৮ সালে কর্ণাটকে বিজেপি-র জয়ের পিছনে কোন কালো গহ্বর, কোন অন্ধকার দিক ছিল কিনা—তা কেউ খুঁজে দেখার চেষ্টা করেননি। আমি যদি এই লেখা তখন লিখতাম, তাহলে আমাকে বলা হত, বিজেপি-নিন্দুক বা ছিদ্রসন্ধানী।

২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন সরকার অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হওয়ার পর সারা দেশেই বিজেপি-র অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল। গভীর হতাশা নেমে এসেছিল দলের সর্বস্তরে। উপরের নেতৃত্ব পরস্পরের প্রতি দোষারোপে মেতে উঠেছিলেন। সোনিয়া গান্ধীর ত্যাগ ও মনমোহন সিং-এর সততার একটা জোরালো ইমেজ তখনও জনমনে খুবই প্রভাবী ছিল। এরকম একটা পরিস্থিতিতে কর্ণাটক নির্বাচনী জয়লাভ খুবই উৎসাহজনক ছিল। তখন কর্ণাটকের জয়— শুধু একটি রাজ্যের জয় নয়, দক্ষিণ ভারতের প্রথম রাজ্য জয়। তাও আবার ওইরকম হতাশাজনক পরিস্থিতিতে। তাই কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহের পরিমাণ এত বেশী হয়েছিল। তার ফলে কেউ দেখতে পেল না যে সেই জয় এসেছিল আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে। এই আদর্শ পরিত্যাগ করাকেই আমি পরাজয় বলে চিহ্নিত করতে চাই। বিজেপি তখন কোন্ আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছিল বা ত্যাগ করেছিল? জাতপাতের অঙ্ক কষে জাতিবাদী রাজনীতির আশ্রয় নেওয়া— এটাই ছিল আদর্শ ত্যাগ। ইয়েদুরাপ্পাকে বিজেপি মাথায় বসিয়েছিল তিনি সমগ্র কর্ণাটককে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন বলে নয়। তিনি কর্ণাটকের প্রভাবশালী লিঙ্গায়েত গোষ্ঠী/জাতির নেতা বলে। এই গোষ্ঠীকে সঙ্গে পেলে রাজ্যে ক্ষমতা করায়ত্ত করা সহজ হবে— এই সমীকরণেই ইয়েদুরাপ্পাকে মাথায় বসানো হয়েছিল।

ইয়েদুরাপ্পা আগে থেকেই দুর্নীতিগ্রস্থ ছিলেন কিনা, দল সেটা জানত কিনা, ক্ষমতার লোভে দল তাঁর দুর্নীতি জেনেও তাঁকে নেতা হিসাবে প্রজেক্ট করেছিল কেন—এ প্রশ্ন আমার কাছে গৌণ। দুর্নীতি করা বা দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করা (দুটো আসলে একই)-সমস্যার কারণ নয় বা মূল নয়। এটা হল সমস্যার পরিণাম। এর মূল অন্যত্র। এর মূল হল সার্বিকভাবে আদর্শবাদকে পরিত্যাগ করা। আদর্শবাদটা কী? আদর্শবাদ ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা হবে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার বা মাধ্যম। আজকাল সমাজ পরিবর্তনের কথাটা সব দলই বেমালুম চেপে গিয়ে রাজনীতিকে শুধু উন্নয়নের হাতিয়ার বলছেন। বিজেপি বরাবরই একটু বেশী শব্দনিপুণ (articulate)। তারা বলছে সুশাসন ও উন্নয়ন— good governance and development। রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সরকারী ক্ষমতা হাতে পেয়ে আমরা এটা করব। এর থেকে ভাল কথা আর কী হতে পারে? দেশের মানুষ এর থেকে বেশি আর কী চাইতে পারে? আলোচনাকে একটু সহজ করার জন্য আমি 'উন্নয়ন' শব্দটিতেই জোর দিচ্ছি। সুশাসন তার মধ্যেই এসে যাবে, কারণ সুশাসন ছাড়া উন্নয়ন হয় না।

এখন মনে করুন দেশে খুব উন্নয়ন হল। রাস্তাঘাট ভাল, বিদ্যুৎ ভাল, দারিদ্র্য ও অনাহার কম, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অবস্থা ভাল। এইরকম একটা অবস্থায় চীন ভারতকে আক্রমণ করল। চীন যথেষ্ট শক্তিশালী দেশ। আমেরিকা রাশিয়াও তাকে ভয় পায়। চীনের সেই আক্রমণকে প্রতিহত করতে হলে শুধু আমাদের সরকার ও সেনাবাহিনীর শক্তিই যথেষ্ট হবে না। তার জন্য সরকার ও সেনাবাহিনীর পিছনে দেশের ১২২ কোটি মানুষের মজবুত সমর্থন চাই। বিদেশী আক্রমণের সেই সংকটকালে সারাদেশের মানুষের এক ভাবাত্মক ঐক্য, তীব্র দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতি চাই। শুধু উন্নয়ন দিয়ে এই জিনিস তৈরী করা যাবে কি? আমার উত্তর ---যাবে না। ভারতের সমস্যা আরও অনেকটাই জটিল ও কঠিন। এদেশের প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী— যারা এদেশের মূল ধারায় মিশতে পারবে না বলেই মত প্রকাশ করেছেন ডঃ আম্বেদকর, শ্রী অরবিন্দ ও আরও অনেক মনীষি। তাই যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪৭-এ দেশ ভাগ করা হল, আজও সেই সাম্প্রদায়িক হানাহানি কচ্ছ থেকে কোকরাঝাড়, কাশ্মীর থেকে মালাড— ঘটেই চলেছে। আমার ধারণায় স্বাধীন ভারতে দশ হাজারেরও অধিক ছোট বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিংসার ঘটনা ঘটেছে। বড় বড় দাঙ্গার সংখ্যাও কয়েকশ। নেলি, কাশ্মীর, মোরাদাবাদ, ভাগলপুর, ভিওয়ান্ডি, মুম্বাই (১৯৯৩), গোধরা, কোকরাঝাড়, মুর্শিদাবাদ (কাটরা মসজিদ) প্রভৃতি। ভারতের বিশাল মুসলিম সমাজকে এদেশের মূল ধারায় সম্মিলিত করার চ্যালেঞ্জ কোন রাজনৈতিক দলই গ্রহণ করেনি। ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বরূপ ভারতীয় জনসংঘ এই চ্যালেঞ্জকে নিয়েছিল। জনসংঘের সর্বোচ্চ নেতা (বিজেপি-তে যাঁর ঠাঁই হয়নি) অধ্যাপক বলরাজ মাধোক মুসলিমদের ভারতীয়করণের (Indianzation) আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর এই আহ্বান বাস্তবসম্মত ছিল কিনা অথবা জনসংঘ এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে সফল হতে পারত কিনা— এ প্রশ্ন সংগত। কিন্তু মুসলিম সমাজের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা-র সমস্যাটিকে এড়িয়ে গিয়ে তো এদেশের জাতীয় সংহতিকেও রক্ষা করা যাবে না, আর চীন পাকিস্তানের মত বিদেশী আক্রমণেরও মোকাবিলা করা যাবে না।

এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ ছাড়াও রয়েছে আরও কয়েকটি বিভেদের উপাদান। জাতি (Caste), ভাষা, রাজ্য ও বিভিন্ন এথনিক গ্রুপ। এই চারটি উপাদানের কোন অংশই ভারতবিরোধী বা দেশদ্রোহী নয়। কিন্তু এদের মধ্যে দূরত্ব বিস্তর। এই দূরত্ব বা gap কে ভারতবিরোধী শক্তি বা ভারতের শত্রুরা তো কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেই। তাদেরকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। প্রশ্ন হল— এগুলিকে রাষ্ট্রমুখী করা এবং এগুলির মধ্যে ঐক্যস্থাপন করার জন্য আমরা কী করেছি এবং রাজনৈতিক দলগুলি এ ব্যাপারে কী ভূমিকা পালন করছে। আমাদের দেশে জাতিগত (caste) বৈষম্য ও বঞ্চনাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। শত শত বছর যেসব অনগ্রসরজাতি বা তথাকথিত নিম্নবর্ণের উপর যে অত্যাচার, অপমান ও বৈষম্য হয়েছে, তার ফলে যে মানসিক দূরত্ব তৈরী হয়েছে— তা শুধুমাত্র উন্নয়ন দিয়ে দূর করা যাবে মনে করা বাস্তবসম্মত নয়। ভাষাগত বিভেদ ও বিদ্বেষও বড় কম নয়। আসামে বহুবার 'বঙাল খেদা' রক্তাক্ত অভিযান, তামিলনাড়ু ও কেরালাতে গেলেই উত্তর ভারতের লোকের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বেলগাঁও নিয়ে মহারাষ্ট্র কর্ণাটক ঝগড়া, উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে খ্রীষ্টান চার্চের মদতে উগ্রপন্থা ও বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব তৈরী হওয়া, মাওবাদী উগ্রপন্থা— এগুলি কি ক্রমাগত আমাদের জাতীয় সংহতিকে নড়বড়ে করে দিয়ে দেশকে দুর্বল করে দিচ্ছে না? এই সংকটের সমাধান কি শুধু উন্নয়ন দিয়ে হবে? শুধু উন্নয়ন দিয়ে যে মানুষের মন জয় করা যায়না— এ প্রমাণ কি আমরা বার বার পাইনি! তাই উন্নয়ন দিয়ে দেশের বৈষয়িক উন্নতি হলেও দেশ শক্তিশালী হয় না। দেশ দুর্বল থাকলে, আবার বিদেশীর পদানত হলে যে সমস্ত উন্নয়নই অর্থহীন হয়ে যাবে— এ সত্যটা কবে আমাদের মনে পড়বে?

এই রাষ্ট্রীয় সংকট মোকাবিলা করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির একটা বড় ভূমিকা থাকার কথা ছিল। তিনটি কাজ তাদের করণীয় ছিল— (১) সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষাগত বৈষম্য দূর, (২) রাষ্ট্রীয় কর্মধারায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় (decision making process) দেশবাসীর সকল অংশগুলিকে সক্রিয় করা ও (৩) দেশবাসীর সকল অংশের মধ্যে, অর্থাৎ সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে তীব্র দেশপ্রেম ও ভাবাত্মক ঐক্যের বোধ তৈরী করা। এরই নাম হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার করার কথা ছিল স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই। সে প্রতিশ্রুতি পালন হল না। কংগ্রেস জাতীয়তাবাদকে ছেড়ে বংশবাদকে আশ্রয় করল। কম্যুনিষ্টরা বিদেশী দাসত্ব করতে লাগল। আর সোশালিস্টরা স্পষ্ট আদর্শবাদের অভাবে অন্তর্কলহে জড়িয়ে পড়ে জাতপাতের রাজনীতিতে গিয়ে পতিত হল। দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংহতির এই সংকটকালে রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয় জনসংঘ সঠিক দিশায় এগোচ্ছিল। কিন্তু ১৯৬৮ সালে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর সেই প্রক্রিয়া ধাক্কা খেল। আর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ১৯৭৭-এ জনতা পার্টি গঠন ও ১৯৮০তে বিজেপি গঠনের পর। ক্ষমতা দখলের জন্য তাড়াহুড়ো লাগল ও আদর্শবাদের সব অঙ্গগুলোকে একে একে পরিত্যাগ করল। আপোষ করতে লাগল দুর্নীতির সঙ্গে। সংকীর্ণ জাতপাতের রাজনীতির সাহায্য নিল। অর্থাৎ ক্ষমতার লোভে বৃহতের সাধনা ছেড়ে ক্ষুদ্রের ভজনা শুরু করে দিল। ফলে খুব তাড়াতাড়িই হল মহাপতন। ১৯৮৪ তে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর নির্বাচনে বিজেপি মাত্র ২টি আসন পেল। এখানে মনে রাখতেই হবে যে তার আগে টানা ৭ বছর দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জনপ্রিয় নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং ১৯৮০ সালে বিজেপি গঠনের সময় ভারতীয় জনসংঘের সমস্ত আদর্শগত পরম্পরাকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ কংগ্রেসী ধাঁচে দলের সংবিধান ও গঠনতন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। পাঠকের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি। সংঘ পরিবারের বিশুদ্ধ স্বদেশী পরম্পরাকে লঙ্ঘন করে দলের নামে ইংরাজী শব্দ (পার্টি) ঢোকানো, পতাকার রঙে সবুজ মেশানো, গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্রকে আদর্শবাদের মূল স্তম্ভ হিসাবে গ্রহণ করা, সর্বস্তরের কমিটি থেকে সংগঠন সম্পাদক পদ বিলুপ্ত করা, ইত্যাদি।

আমার মতে ১৯৮৪-র মহাপতন বিজেপি-র সামনে আদর্শবাদের পথে ফিরে যাওয়ার আর একটা সুযোগ তৈরী করে দিল। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বাজপেয়ীকে সরে যেতে হল। আদবানি এলেন। এবং এলেন আদর্শবাদের পথে ফিরে আসার প্রত্যাশা জাগিয়ে। সভাপতি হয়েই বললেন - BJP is a party with difference। অর্থাৎ বিজেপি অন্য দলের মত নয়, আলাদা। যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ কথা। তারপর তিনি বললেন, ভারতের জাতীয়/রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি কোন মিলীজুলি সংস্কৃতি বা composite culture নয়। আমাদের দেশের একটি সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ (cultural nationalism) আছে। অর্থাৎ আমাদের দেশের একটি সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবোধ আছে। নিঃসন্দেহে এতে আর এস এসের দীর্ঘদিনের ঘোষিত 'হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব'-এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তারপর তিনি তিনটি দাবীকে সমগ্র রাষ্ট্রের সামনে এজেন্ডা হিসাবে তুলে ধরলেন। কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি, সারা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (uniform civil code) চালু করা ও অযোধ্যায় শ্রীরামের জন্মস্থানে মন্দির নির্মাণ। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আদবানি করেছিলেন। তিনি আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে চূড়ান্ত ভন্ডামির মূলে আঘাত হেনে একে তিনি ''ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা'' (pseudo secularism) নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। এসবের পরিণাম— দেশের রাজনীতিতে আলোচ্য বিষয়সূচী বা এজেন্ডা বিজেপির দ্বারা তৈরী হতে লাগল। মনে রাখতে হবে— তখন লোকসভায় মাত্র ২। অর্থাৎ বিজেপির দ্বারা শুরু করা তত্ত্বগুলি যে গোটা দেশের এজেন্ডায় পরিণত হল— তা তার রাজনৈতিক শক্তির জোরে নয়, তাত্ত্বিক শক্তির জোরে। সেই সময় সুপ্রীম কোর্টে শাহবানু মামলার রায়, মুসলিম মৌলবাদের কাছে রাজীব গান্ধীর লজ্জাজনক আত্মসমর্পণ ও কাশ্মীরে জেহাদীদের জঙ্গী কার্যকলাপ এই তত্ত্বকে শক্তিশালী করেছিল।

এরপর এল বৈপ্লবিক পদক্ষেপ যা স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে কেউ কোনদিন কল্পনা করেনি। ১৯৮৯ সালে হিমাচল প্রদেশের পালমপুরে অনুষ্ঠিত বিজেপি-র রাষ্ট্রীয় কর্মসমিতির বৈঠকে বিজেপি প্রস্তাব গ্রহণ করল---দল অযোধ্যায় রামমন্দির স্থাপনের দাবীতে সারা দেশব্যাপী আন্দোলন করবে এবং শ্রী আদবানি এই দাবী নিয়ে রথযাত্রা করবেন। এই রথযাত্রায় যে বিপুল জনসমর্থন পাওয়া গেল, তা দেশের রাজনৈতিক চিত্রটাকেই পাল্টে দিল। সেকুলার ও বামপন্থী রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁদের মনে হল যে এতদিনের উদার ও সেকুলার দশটা হঠাৎ যেন গোঁড়া সংকীর্ণ ধর্মান্ধ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতায় ভরে গেছে। আমরা বুঝলাম—

শেষাংশ ৫ পাতায়

৪ পাতার শেষাংশ

দেশ নিজেকে ফিরে পাচ্ছে। আত্মবিস্মৃত জাতির স্মৃতি ফিরে আসছে। এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত কাহিনী বলি। আমি তখন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক। একটা বড় হ্যান্ডবিল লিখে প্রকাশ করেছিলাম যার শীর্ষক ছিল— ''ভারতীয় মুসলমানদের শরীরে কার রক্ত বইছে- রামের না বাবরের''? হ্যান্ডবিলটা এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে জেলা শহরগুলিতে অনেক জেরক্স দোকানে ওটা নিয়ে জেরক্স করাতে গেলে দোকানদার মূল হ্যান্ডবিলটা না নিয়ে তার স্টক থেকেই জেরক্স দিয়ে দিত। সেই একই সময়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অসংখ্য ছোট বড় সভা ও অযোধ্যায় একের পর এক করসেবা-র কর্মসূচী নিতে লাগল। বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সংঘ পরিবারের সমস্ত কর্মসূচীতে অভূতপূর্ব সাড়া ও জনসমর্থন। আর অযোধ্যার করসেবায় তো জনসমুদ্র। মনে হত যেন গোটা দেশ, সর্বজাতি, সকল সম্প্রদায়, সকল গোষ্ঠী এসে মিশেছে সেখানে। মনে হল যেন রামের নামে গোটা দেশ, সমগ্র হিন্দুজাতি জেগে উঠেছে। হিন্দুসমাজ যে জাতপাত, ভাষা, প্রান্তীয়তা, দল-উপদলে শতধা বিভক্ত, কোথায় গেল সেসব ভাগ, সংকীর্ণ গণ্ডি? সব গণ্ডি ভেঙে, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চন্ডাল, সাধু গৃহী, ব্যবসায়ী চাকুরিজীবী, শিক্ষক ছাত্র— রামের নামে সবাই চলেছে অযোধ্যার দিকে— সরকারের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে, পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে, পাকা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে। উত্তরপ্রদেশের গ্রামবাসীরা তাদেরকে বাড়িতে ডেকে বসাচ্ছে, সেবা করছে, ফোলা পায়ে সরষের তেল গরম করে মালিশ করে দিচ্ছে। কেউ কাউকে জাত জিজ্ঞাসা করছে না। সেসব দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল, মানুষ যতক্ষণ বৃহতের আস্বাদ পায়নি ততক্ষণই সে তার সংকীর্ণ পরিচয় নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আজ সে বৃহত্তর স্বাদ পেয়েছে, তাই সংকীর্ণ পরিচয়ের ক্ষুদ্র গন্ডি তাকে আর ধরে রাখতে পারছে না। এর অনিবার্য পরিণাম হল রাজনীতিতে। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি-র সরকার গঠিত হল। ১৯৯১-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র সীট অনেক বাড়ল। ১৯৮৪-র ২ থেকে ১৯৯১-এ বেড়ে ১২০ হল। ১৯৯৬-এ হল ১৬১। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠন করল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অকংগ্রেসী কোন দল সমর্থন না করায় ১৩ দিনে সেই সরকার পড়ে গেল। তারপর শুরু হল উল্টো যাত্রা। নেতৃত্ব আর ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না। জনতার যে আশীর্বাদ আমরা পেয়েছিলাম, তার থেকেও বড় হয়ে গেল ক্ষমতার মোহ। তাই বিজেপি তার তাত্ত্বিক আধার অর্থাৎ আদর্শবাদকে ছেড়ে দিল সমতা-মমতা-ললিতাদের সমর্থন পেতে। ১৯৯৮ সালে নির্বাচনের আগেই দলের ম্যানিফেস্টো থেকে সেই আদর্শগত বিষয়গুলিকে বাদ দেওয়া হল যে বিষয়গুলি ভারতের রাজনীতির নেহেরুপন্থী ও বামপন্থী চিন্তাধারার (Nehruvian-leftist consensus) মৃত্যুঘণ্টা প্রায় বাজিয়ে দিয়েছিল। বেশীরভাগ মানুষই মনে করেছিল যে এগুলোকে বাদ দেওয়া নেহাতই স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল মাত্র। তাই ৯৮-এর নির্বাচনেও বিজেপি মানুষের দুহাত ভরা আশীর্বাদ পেল। সিট আরও বেড়ে হল ১৮১। কিন্তু তার পর দেখা গেল যে ওটা রণকৌশলগত বাদ দেওয়া নয়। সত্যিই তারা এজেন্ডা ও আদর্শকে বাদ দিয়েছে। পরিণামে, ৬ বছর খুব ভালভাবে সরকার চালিয়েও, কারগিল যুদ্ধ জিতেও ২০০৪-এ ১৪০, ২০০৯-এ ১১৬।

ভোটে বিজেপির এই উপুর্যপরি পরাজয়, অন্ততঃ আমার কাছে খুব বড় দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। আমার কাছে বড় চিন্তার বিষয় হল, ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য আছেই, কিন্তু সেটা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত নয়। তার ফলেই রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের দরবারে আমরা কোন সম্মানের জায়গায় যেতে পারছি না। তার থেকেও বড় কথা হল ঃ (১) আমাদের দেশের ভিতরে ইসলামিক ও অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদপন্থী শক্তিগুলোর মোকাবিলা করতে পারছি না। (২) প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্রগুলিও (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল) ভারতের ক্ষতি সহজেই করে চলেছে। (৩) বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় হিন্দুদের উপর অত্যাচার থামছে না, (৪) চীনের আগ্রাসী কার্যকলাপের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দেশকে দুর্বল বলে মনে হচ্ছে।

এই রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় প্রেরণা নির্মাণের কাজটা দুবার শুরু হয়েও ব্যাহত হল। প্রথমবার দীনদয়াল উপাধ্যায়ের হত্যাকান্ডে, দ্বিতীয়বার বাজপেয়ী সহ নেতৃত্বের ক্ষমতা লোভে। রামমন্দির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতপাত-ভাষা-প্রান্তবাদের যে সংকীর্ণ বেড়াগুলো ভাঙছিল, তার ফলে এক বিরাটের অভ্যুদয় হচ্ছিল। যারা তখনও এই রামমন্দির আন্দোলনের বাইরে ছিল, উদাহরণ— উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেক রাজ্য, তারাও এই বিরাটের সঙ্গে এসে মিশে যেত। সেই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল। কিন্তু চটজলদি ক্ষমতার লোভে সেই বিরাটের সাধনা ছেড়ে ক্ষুদ্রের মনঃতুষ্টি করতে লেগে গেলেন নেতৃত্ব। এমনকি দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদের হত্যাকারীর দলের (ফারুক আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স) সঙ্গেও হাত মেলালেন। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ক্ষমতাতেই এই নেতৃত্ব সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। এই রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে যে এক বিরাট মজবুত রাষ্ট্রকাঠামো তৈরী করতে পারতেন, সেটুকু ধৈর্য ধরলেন না। তাই আমার মতে সমস্যার মূল-দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার নয়। সমস্যার মূল হল— অল্পে সন্তুষ্টি। আমাদের ঋষিরা যে আহ্বান জানিয়ে গিয়েছিলেন— 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্'- সেই আদর্শকে ধরে না রেখে অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। দেশের হল অপূরণীয় ক্ষতি।

কর্ণাটকের নির্বাচনের ফলকে আমি এই দৃষ্টিতেই দেখি। বিজেপিকে এরকম বহু সংকটে পড়তে হবে আদর্শ ত্যাগ করার জন্য। আর ওইসব সংকট থেকে উত্রানোর জন্য আরও আপোষ করতে হবে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই বিজেপি কংগ্রেসের মত একটি দলে পরিণত হবে। এখন থেকেই মানুষ বিজেপিকে কংগ্রেসের বি-টিম বলতে শুরু করেছে। দেশের জন্য সেটা কি খুব প্রয়োজনীয়? এই পরিস্থিতি বা পরিণতির বদল হতে পারে যদি কোন দৃঢ় সংকল্প সম্পন্ন আদর্শবাদী নেতা এসে পার্টির হাল ধরেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ পেতে তাড়াহুড়ো না করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদটাকেই বৃহৎ প্রাপ্তি বলে ধরে না নিয়ে তার থেকেও বৃহৎ লক্ষ্য সামনে রাখেন।

টাকা ধার দিয়ে চাওয়ার জের

উস্তিতে খুন হতে হল গৃহবধূকে

১১ এপ্রিল ভোর চারটে নাগাদ দঃ ২৪ পরগণার উস্তি থানার অন্তর্গত উস্তিবাজরে আকবর খান নামক এক ব্যক্তির টায়ার সারানোর দোকানের পিছনের খাল থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া হালদার (৫০ বছর) নামক এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মুহূর্তে এলাকায় লোক জড়ো হয়ে যায় এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার জামাই অশোক মণ্ডলের কথা অনুযায়ী আকবর খান এই হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহ করা হয়। উপস্থিত লোকজনেরা আকবরকে মারধোর করে। ইতিমধ্যে উস্তি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার জন্য আকবরকে গ্রেপ্তার করে ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মৃতদেহ তুলে নিয়ে যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে কেন খুন করা হল তা জানতে বেশ কয়েক মাস পিছিয়ে যেতে হবে। উস্তি বাজারে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একটি সব্জির দোকান আছে। তার দোকানের পাশেই আকবর খানের টায়ার সারানোর দোকান। বেশ কয়েক মাস আগে আকবর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। এই টাকা চাওয়া নিয়েই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে আকবরের ঝগড়ার সূত্রপাত। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জামাই অশোক মণ্ডলের বক্তব্য, এই টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে আকবর তার শাশুড়িকে কয়েকবার প্রাণে মারার হুমকিও দেয়।

সাধারণতঃ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী রাত আটটার মধ্যেই সব্জি বিক্রি করে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু ১০ই এপ্রিল রাত এগারোটা বেজে গেলেও যখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বাড়ি ফেরে না, তখন তার জামাই বেশ কয়েকজন লোক নিয়ে তাকে খুঁজতে বেরোয়। অবশেষে ভোর চারটে কুড়ি নাগাদ অশোকবাবু ও তার সঙ্গীরা আকবর খানের টায়ারের দোকানের পেছনের খালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মৃতদেহ খুঁজে পায়। ইতিমধ্যে শ'দেড়েক লোক ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে গেছে। তাদের প্রশ্নে অসংলগ্ন উত্তর দিলে সন্দেহের তীর আকবরে দিকে যায় এবং উত্তেজিত জনতা আকবরকে মারধোর করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আকবরকে গ্রেপ্তার করে।

এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতি কর্মীরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষও এই প্রতিবাদে সামিল হয়। তাদের মতে এই হত্যাকাণ্ডে আকবরের সঙ্গে বেশ কয়েকজন জড়িত অথচ পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার না করে আড়াল করার চেষ্টা করছে। এর প্রতিবাদে উস্তি বাজার ও নৈনানে রাস্তা অবরোধ করা হয়। অবরোধ প্রায় দু ঘণ্টা ধরে চলে। ঘটনাস্থলে এস.ডি.পি.ও. উপস্থিত হয় ও অবরোধকারীদের বলে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে, এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত থাকলে তাদেরকেও গ্রেপ্তার করা হবে। এরপর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু এলাকার প্রভাবশালী মুসলিম নেতার নির্দেশে আকবর ছাড়া আর কাউকে পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করেনি।

উস্তির থানা থেকে আকবর খানের বিরুদ্ধে আদালতে একটি কেস (কেস নং ১০৬/১৩) দায়ের করা হয়েছে। তাতে ভি.আর. ৮৮৫/১৩, ৩০২, ২০১, ৩৪, আই.পি.সি. প্রভৃতি ধারা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে আকবর খান জেল হাজতে আছে।

মন্দিরবাজারে অবৈধভাবে জমি দখলে চেষ্টা

গোপালচন্দ্র দাসের ঘাটেশ্বর কয়েলপাড়ায় প্রায় ১ বিঘার মতো জমি আছে যার বাজার মূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা। জমির খতিয়ান ৭৫০ এবং দাগ নম্বর হল ৮৩৯ ও ৮৪১। ঐ অঞ্চলে প্রায় দশ-বারো ঘর মুসলমানের বাস। তারা নিজেদের সুবিধার জন্য একটি রাস্তা নির্মাণ করছিল যা গোপালবাবুর জমির উপর দিয়ে যাবে। গোপালবাবু কিছুতেই মুসলমানদের তার জমির উপর দিয়ে রাস্তা করতে দিতে রাজি নয়।

এমতাবস্থায়, ১৭ই এপ্রিল রাত তিনটে নাগাদ প্রায় ৫০০ জন মুসলমান দল বেঁধে এসে গোপালবাবুর জমির মাটি তুলে ফেলতে থাকে। সেই দেখে গোপালবাবু দৌড়ে তাদের থানাতে গেলে প্রায় ৫০ জন নারী-পুরুষ তাকে বঁটি, কাটারি নিয়ে আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে একজন রহমতউল্লা খান গোপালবাবুকে শাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু আঘাত তার মাথায় না লেগে কপালে লাগে। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তপাত হতে থাকে। তবু মুসলমানরা তাকে না ছেড়ে সেই অবস্থায় মারধোর করতে থাকে। গোপালের বাঁচাও বাঁচাও চিৎকারে তার প্রতিবেশী সহদেব মণ্ডল (পিতা অমূল্য মণ্ডল) তাকে বাঁচাতে গেলে মুসলমানেরা তাকেও ব্যাপক মারধোর করে। গুরুতর আহত গোপালচন্দ্র দাস ও সহদেব মণ্ডলকে নৈরাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নৈরাট হাসপাতালে মন্দিরবাজার পুলিশ ঘটনার তদন্তে এলে সেখানেই মন্দিরবাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে এই বর্বরোচিত আক্রমণের জন্য পুলিশে নালিশ করা হয় তারা হল রহমতউল্লা খান, আমিরুল শেখ, নজরুল শেখ, আব্দুল জমাদার, রমজান জমাদার ও আরও ২৫ জন। হিন্দু সংহতি কর্মী রাজকুমার সর্দার এই ঘটনার খোঁজখবর নিতে গেলে মুসলমানরা তাকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। তবে রাজকুমার সব বাধা পেরিয়ে আহত দুজনের বিষয়ে খোঁজখবর নেয় ও তাদের ছবি তুলে আনে।

রামপুরহাটে রামমূর্তি ভাঙল দুষ্কৃতি

রামপুরহাট পুরসভার অন্তর্গত ব্রাহ্মণী গ্রামে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরেও ১৯ এপ্রিল রামনবমীর দিন রামপূজার আয়োজন করা হয়েছিল। এলাকাবাসীরা বেশ ধূমধাম করেই প্রতিবছর রাজপূজা করে। পূজার পরদিন সকালে স্থানীয় মানুষ দেখে যে রাম-সীতা সহ অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। এই ঘটনা এলাকাবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং তারা পানাগড়-মোড়গ্রাম জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। রামপুরহাটের অধিকাংশ ব্যবসায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের দোকান বন্ধ রাখে। এই ভাঙচুরের অভিযোগের তীর বপটুই নামক মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের লোকেদের দিকে ছিল। উল্লেখ্য কয়েক মাস আগে বপটুই গ্রামে বোমা তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণে প্রায় ১০-১২ জন মুসলিম যুবক মারা যায়। যদিও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দল বিষয়টিকে ধামাচাপা দিয়ে দেয়।

হিন্দুদের ক্ষোভকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক দল একটি মুসলিম পাগলকে মূর্তি ভাঙার জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের এই অসৎ উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এতে হিন্দুদের উত্তেজনা প্রশমিত করা যায়নি। তারা রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনকে উপেক্ষা করে অবরোধ চালিয়ে যেতে থাকে। প্রায় চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। প্রশাসন তখন র‍্যাফ নামিয়ে ব্যাপক লাঠি চালিয়ে অবরোধ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। মূর্তিভাঙা ও রাজনৈতিক দলের এই হিন্দু নিষ্পেষনের ফলে দলমত নির্বিশেষে অঞ্চলের হিন্দুদের ক্ষোভ প্রায় বন্‌ধের আকার নিয়েছিল।

পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে

বনগাঁয় হিন্দু সংহতি-র মিছিল

পাকিস্তানীদের নৃশংস অত্যাচারে ভারতীয় সবরজিত সিং-এর মৃত্যুতে বনগাঁয় হিন্দু সংহতি-র প্রতিবাদ মিছিল

পাকিস্তানী পতাকা পোড়ানো হল বনগাঁয়

ভারত সরকারের ব্যর্থতা ও পাকিস্তানের চরম বর্বরতার বলি ল্যান্সনায়ক সুধাকর সিং ও হেমরাজের পর সম্প্রতি বাইশ বছর জেলখাটার পর পাকিস্তানে নৃশংসভাবে হত হল সর্বজিৎ সিং। তারই প্রতিবাদে হিন্দু সংহতির বনগাঁ শাখার পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয় গত ৬ই মে। বিকাল পাঁচটায় মিছিল শুরু হয়ে বনগাঁ টাউন হল থেকে রায় ব্রীজ, মতিগঞ্জ হয়ে রাখালদাস ব্রীজ, বাটার মোড়, যশোর রোড, স্টেশন রোড হয়ে আবার বাটার মোড়ে এসে চরম বর্বতার প্রতিবাদে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়। সেইসময় মিছিলে অংশ গ্রহণকারী সংহতিকর্মী ও উপস্থিত হিন্দুদের মধ্যে পাকিস্তান বিরোধী স্লোগানের মাধ্যমে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সন্ধ্যা সাতটার সময় ত্রিকোণ পার্কে এসে মিছিলটি শেষ হয়। বনগাঁর লড়াকু নেতা অজিত অধিকারী তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পাকিস্তানের ভারত ও হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাবকে তুলে ধরেন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতি রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ রায়। মিছিলে প্রায় ২০০ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। পুরো মিছিলটির নেতৃত্বে ছিল হিন্দু সংহতির যুব নেতা অজিত অধিকারী, সমীর মণ্ডল, নিশীথ ঘোষ ও অভিজিৎ দাস।

মিছিল চলাকালীন পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবের সঞ্চার হয়। অনেকে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে। কেউ কেউ বলে, একমাত্র হিন্দু সংহতিই হিন্দুদের কথা বলছে এবং হিন্দুদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

বাগনানে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা প্রতিরোধে মার খেল দুষ্কৃতি

হাওড়ার বাগানানে গত ১১ তারিখে মঙ্গলা নামে এক হিন্দু গৃহবধূ যখন মাঠে ঘাস কাটছিল তখন মহম্মদ সঞ্জীব নামে একটি মুসলমান ছেলে তাকে পেছন থেকে আক্রমণ করে শ্লীলতাহানি করে। কিন্তু মঙ্গলা কোনমতে মহম্মদ সঞ্জীবের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে স্থানীয় একটি ক্লাবে উপস্থিত হয়ে হিন্দু ছেলেদের তা বলে। ঘটনাটি মুহূর্তে বনে আগুন লাগার মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরা এসে মহম্মদ সঞ্জীবকে মারধোর করে। কিন্তু মেরেও সঞ্জীবকে নাজেহাল করা যায়নি। এরপর মঙ্গলা ধাড়া স্থানীয় সুভাষ ভৌমিক নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে বাগনান থানায় গিয়েএকটি ডাইরি করে, ডাইরি নম্বর ৭৬৭/১৩। এরপর যখন তারা ফিরে আসছিল তখন মহম্মদ সঞ্জীব ও তার বন্ধু মহম্মদ ফুচকা তাদের আটকায় এবং সুভাষ ভৌমিককে তারা ব্যাপক মারধোর করে। সুভাষ তখন আবার বাগনান থানায় গিয়ে বিষয়টি জানায়। কিন্তু পুলিশ স্পটে আসতে বা মহম্মদ সঞ্জীব ও ফুচকাকে গ্রেপ্তার করতে রাজি হয়নি। হিন্দু যুবকেরা প্রশাসনের কাছে সাহায্য না পেয়ে মহম্মদ সঞ্জীব ও মহম্মদ ফুকরা বাড়ি ভাঙচুর করে। এই ঘটনায় এলাকাবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরে বেআইনি নির্মাণ রুখল স্থানীয় হিন্দুরা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত রাধামণি বাজারে গত ২২শে এপ্রিল, ২০১৩ মুসলমানদের এক বেআইনি নির্মাণে বাধা দেওয়ায় হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার নেমে আসে। জানা গেছে যে এই আক্রমণের প্রধান কালপ্রিট জয়নাল (৫০) নামক এক মুসলিম, যার বাড়ি ভগবানপুর গ্রামে (পোঃ নারাণফাঁড়ি)। জয়নাল তার একবন্ধু মনোজ গিরির সঙ্গে রাধামণি বাজারে পোষাক বিক্রি করত। এই রাধামণি বাজারে এক অলিখিত নিয়ম আছে কোন দোকান বা জায়গা কোন অহিন্দুকে বিক্রি করা যাবে না। সেজন্য জয়নাল মনোজ গিরির নাম করে রবীন ভক্ত নামে এক ব্যক্তির থেকে একটি দোকানঘর কেনে।

৪১ নম্বর জাতীয় সড়কটি তৈরি হয়েছিল হিন্দুদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমি দান করার ফলে। জয়নাল ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে রাধামণি বাজারের কাছে একটি জমি দখল করে সেখানে বাড়ি করতে চেষ্টা করে, যদিও সে জানে যে এই অঞ্চলের জমি কোন অহিন্দু কিনতে পারে না। তবু জয়নাল ঐ জমিতে বাড়ি তৈরি করতে শুরু করে। বলাকা বাজার কমিটি এই বেআইনি নির্মাণের তীব্র আপত্তি জানায়। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জয়নাল বাজার কমিটির অতুল সরকার নামক এক ব্যক্তিকে হুমকি দেয়। এই অতুলবাবু রবীন ভকতের দোকানের পাশে একটি মোটর গ্যারেজে কাজ করেন। ৬ই এপ্রিল বলাকাবাজারের পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা জয়নাল ও মনোজকে তাদের একটি মিটিং-এ থাকতে অনুরোধ করে। কিন্তু জয়নাল ও মনোজ কেউই মিটিং-এ আসেনি। ৭ই এপ্রিল জয়নাল বেশ কিছু মুসলিম নিয়ে বিতর্কিত জমিতে ঢোকার চেষ্টা করে এবং তার সঙ্গে তমলুক থানা দুজন পুলিশ মানিক আদক ও স্বপন চক্রবর্তী ছিল। পুলিশ দুজন এসেছিল বাজার কমিটির সঙ্গে কথা বলে জয়নালের পক্ষে এক সমাধান করতে। কিন্তু হিন্দুরা পুলিশের এই কথা মেনে নিতে চাইনি। তখন ঠিক হয় যে ১৪৪ ধারার মধ্যে এই নির্মাণ হবে এবং জয়নালকে কোর্ট এবং পঞ্চায়েতের অনুমতি আসতে হবে।

১৪ই এপ্রিল বলাকা বাজার কমিটির সহসভাপতি দীপক ভট্টাচার্যকে আলাউদ্দিন নামক এক ব্যক্তি ফোনে হুমকি দেয়। আলাউদ্দিন বলে হিন্দুরা যদি মায়ের দুধ খেয়ে থাকে, তবে মুসলমানদের বাধা দিয়ে দেখাক। ২১শে এপ্রিল জয়নাল তিনটে গাড়ি করে প্রায় ৬০ জন মুসলিম নিয়ে ঐ বিতর্কিত জায়গায় আসে। জয়নালের কাছে কোন কোর্ট ও পঞ্চায়েতের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও তারা মাটি খুঁড়তে শুরু করে। স্বভাবতই তাদের এই অনৈতিক কাজে স্থানীয় হিন্দুরা বাধা দেয়। হঠাৎ-ই মুসলিমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১২ জন হিন্দু অস্ত্রের আঘাতে দারুণভাবে আহত হয়, তাদের মধ্যে শ্রীতম কুমার মিদ্দা (বাড়ি ভুবন কালুয়া, পোঃ কেলোমাল, তিনি একজন প্রাথমিক শিক্ষক) আঘাত ছিল গুরুতর এবং তাকে তমলুক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপর একজন শঙ্কর মাইতি (২৫) কলকাতার সি.এম.আর.আইতে. ভর্তি করা হয়। শঙ্করবাবু আঘাতের ফলে ডান কানে শ্রবণ শক্তি হারায়।

এরপর হিন্দুরা মুসলিমদের এই আক্রমণের ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাত করে। হিন্দুদের মারে ২৫ জন মুসলিম পালিয়ে যায়। অন্য মুসলমানরা নির্মীয়মাণ বাড়ির উপরে উঠে সেখান থেকে পাথর ছুঁড়তে থাকে। ক্ষিপ্ত হিন্দুরা মুসলমানদের একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ এলেও ঘটনাকে আয়ত্তে আনতে তাদের খুব বেগ পেতে হয়। পুলিশ হিন্দুদের আশ্বাস দেয় যে ঐ জমিতে আর কোন বেআইনি নির্মাণ হবে না। পুলিশ ১৮ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেয় কোর্ট।

মৌলবাদীদের তাণ্ডবে উত্তাল বাংলাদেশ

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012